তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ভার্সিটিতে শাসক দলের বিপর্যয় ❑ মাথাভারী মন্ত্রিসভার অন্তর্নিহিত দুর্বলতারই কি বহিঃপ্রকাশ

মোবায়েদুর রহমান ॥ শামসুন্নাহার হলের সাম্প্রতিক গোলযোগ, গোলযোগোত্তর ছাত্র আন্দোলন এবং সবশেষে ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায়– এই সামগ্রিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে শাসক দল বিএনপি তথা বিএনপি সরকারের কতিপয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতা উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সবশেষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের স্থগিত কার্যক্রমে নতুন জীবন সঞ্চারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও বিএনপি'র রাজনৈতিক চরিত্রের একটি বিশেষ দিক প্রতিভাত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট দিবসব্যাপী আন্দোলমুখর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, ৬০ সদস্যবিশিষ্ট জায়েন্ট সাইজের ক্যাবিনেট নিঃসন্দেহে একটি মাথাভারী প্রশাসন। এ ধরনের টপহেভী প্রশাসন চরিত্রগতভাবেই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকে। আর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন বড় দেরী হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সংকটেও সরকার এবং শাসক দলের ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। যে দল জোটের শরীক দলসমূহ ছাড়াই নির্বাচনে ১৯৭টি আসন অর্থাৎ এককভাবে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে, তাদের একটি 'কিচেন ক্যাবিনেট' থাকার কথা। যে কোনরকম সংকট সৃষ্টি হলে এই কিচেন ক্যাবিনেট তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকে বসে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিএনপি'র যেসব হেভিওয়েটের নাম প্রায়শই উচ্চারিত হয়, ধারণা করা হয় যে, তাদেরকে নিয়েই কিচেন ক্যাবিনেট গঠিত। কিন্তু ৮ দিনের উর্মিমুখর ঘটনাবলী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সংকটকালে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে দৈনন্দিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত সেই ধরনের কোন 'ককাস', ইনার সার্কেল বা কিচেন ক্যাবিনেট বিএনপিতে নেই। ভারতে সব

১৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

...ন্ত বিত্রসত্রক মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকা ভার্সিটিতে শাসকদলের বিপর্যয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের আমলেই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা। কিন্তু তারপরেও সব সময়ে রয়েছে একটি 'পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি' বা রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি। সরকার যখন বহিঃশত্রু বা আভ্যন্তরীণ সমস্যায় হুমকির সম্মুখীন হয় তখন বিদ্যুৎগতিতে বৈঠকে বসে এই রাজনীতিবিষয়ক কমিটি। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তই মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয় অথবা সময় সংকীর্ণ হলে সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজ করেন।

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু ঘটে গেল সেটি সমগ্র জোট সরকারের জন্য একটি বড় রকমের রাজনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু ৮ দিনের ঘটনাক্রমে দেখা গেল, জোট সরকারের শরীক দলসমূহের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সমন্বয় নেই। বিএনপি ছাড়া অন্য শরীকরা মনে হয় এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। এই ঘোরতর সংকটে বড় শরীক বিএনপি তাদের সাথে কোন আলোচনা করেনি, নাকি তারাই চরম সুবিধাবাদী হিসেবে গায়ে বাতাস লাগতে দেয়নি, সে বিষয়টি দেশবাসীর কাছে এখনো রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। নাকি এটিও বিশালাকৃতির মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয় সমন্বয়হীনতার অনিবার্য ফসল? এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, ২৩ তারিখের সারাদিনের ঘটনা এবং ঐ তারিখে রজনীর মধ্য ও শেষ প্রহরের আলোড়ন সম্পর্কে এই সুবিশাল মন্ত্রিসভার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী কি একই সূত্রে গ্রথিত ছিল? ২৪ জুলাই থেকে শুরু করে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে যেসব ঘটনা ঘটেছে, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মিলন এবং ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীসহ বিবিসিকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারসহ ঐসব ঘটনা এই প্রতিনিধি অডিও ক্যাসেটে ধারণ করেছেন। ঐ টেপ বাজিয়ে দেখা যায় যে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী একই সমতলে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে প্রতিমন্ত্রী মিলনের এপ্রোচকে মনে হয়েছে বেশ পলিটিক্যাল। পক্ষান্তরে শিক্ষামন্ত্রীর উক্তিসমূহকে মনে হয়েছে এ্যাপলিটিক্যাল, অর্থাৎ অরাজনৈতিক। সমগ্র সংকটে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি বজায় রেখেছে এক অর্থপূর্ণ নীরবতা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, শাসকদল কি ভেবেছিল যে, ২৩ জুলাই থেকে সূচিত আন্দোলন ছিল রাজনীতি বিবর্জিত কতিপয় তরুণ-তরুণীর তাৎক্ষণিক ক্ষুব্ধতার বহিঃপ্রকাশ? সম্ভবত তাই। আর সে কারণেই সম্ভবত তারা আন্দোলনের পদধ্বনি শুনতে পাননি? আর শুনতে পাননি বলেই আন্দোলনের ঘূর্ণি হাওয়ায় আটকা পড়েন। আটকা পড়ার পর অসচেতন এবং অসহায়ের মত খাবি খেতে থাকেন। খাবি খেতে খেতে বেচারা আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে বলিদানের যূপকাষ্ঠে চড়িয়ে বিপদ তারণ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং তার প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় মন্ত্রী এবং তার প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এবং তার মুখ্য সচিব, সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা– এদের পরস্পরের মধ্যে কি চিন্তাধারার কোন ঐক্যতান ছিল? ঘটনাবলীদৃষ্টে সেটা মনে হয় না।

তাই যদি না হবে তাহলে শামসুন্নাহার হলের ২/৩ শত ছাত্রী সকাল থেকেই হলে বিক্ষোভ করছিল কেন? কোন ইস্যুতে? ঘটনার সূতিকাগার তো সেখানেই। ওরা চাচ্ছিল শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট হিসেবে সুলতানা শফির আরেক দফা এক্সটেনশন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী কি জানতেন যে, পার্লামেন্টে বিল পাস হওয়ার পরেও অধ্যাপিকা সুলতানা শফি প্রভোস্ট হিসেবে তার অফিস কক্ষ থেকে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের টাঙানো ছবি নামাননি? ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী যদি কোন বড় ভুল করে থাকেন তাহলে সেটা হল আওয়ামী রাজনীতির মন্ত্রে দারুণভাবে দীক্ষিত এমন একজন শিক্ষিকাকে প্রভোস্টের স্পর্শকাতর পদ থেকে আগেভাগেই অপসারণ না করা। সকাল বেলা বিক্ষোভ করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে তখন ঐ কয়েকশ' ছাত্রী হল থেকে বেরিয়ে ভিসির বাসায় যায় এবং সুলতানা শফির এক্সটেনশনের দাবিতে ভিসির বাসভবন দু'ঘণ্টা পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখে। ভিসির কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট আশ্বাস না পেয়ে তারা হলে ফিরে আসে। এখানে তারা ছাত্রদলের চারজন নেত্রীকে হল থেকে বের করার দাবিতে সভা করা শুরু করে। এই সভা এবং শ্লোগানে মাইক ব্যবহার করা হয়। এসব ছাত্রী কি নিজেরাই ভিসির বাসভবনে গিয়েছিল? নাকি নেপথ্য থেকে সূতা নাড়িয়ে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে? ওরা কি গাঁটের পয়সা খরচ করে হলে মাইক এনেছিল? ভিকারুননিসার প্রিন্সিপাল হামিদা আলীর স্বপক্ষে পরিচালিত আন্দোলন নামক নাটক দেখার পরেও কি বিএনপির রুই-কাতলাদের বুঝতে বাকী ছিল যে, কে বা কারা এই ছাত্রী বিক্ষোভের নাটের গুরু?

বিএনপির রাঘব-বোয়ালরা কি একবারও ভেবেছেন যে, ২৪ তারিখে ছাত্রদের সভা এবং মিছিলের পরপরই ২৪টি বাস এবং মোটরকার ভাংচুর করল কারা? ডাইহার্ড কর্মী ও ক্যাডার ছাড়া কি এসব সহিংস কাজ আর কেউ করে? ওদের সভা এবং মিছিল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করা হল কেন? যামিনীর তৃতীয় প্রহরে শামসুন্নাহার হলে যে 'রেইড' হল তার জন্য যে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীই এককভাবে দায়ী, এমন ধারণা তাদেরকে কে দিল? এতগুলো ছাত্র সংগঠন থাকতে শুধুমাত্র বিএনপিপন্থী ছাত্রদলকে আন্দোলনকারী এবং বাইরে তাদের সমর্থক পত্র-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী এবং পলিটিশিয়ানরা 'ভিলেন' বানালো কেন? গত নভেম্বর মাসে ছাত্রদলকে ইমাসকুলেট বা নির্বীর্য করা হয়। কিন্তু ছাত্রলীগসহ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহ দাপটের সাথেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে। পরবর্তী ঘটনাবলী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ছাত্রদলের অনুপস্থিতিতে মাঠ খালি পেয়ে প্রতিপক্ষ ওয়াকওভার করে বা ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে হয়ে ওঠে ৩১ জুলাই ভিসি এবং প্রক্টরের পদত্যাগ এবং শহীদ মিনারে অনশন ভাঙ্গার পর। অনশন ভাঙ্গেন বামপন্থী প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং জনাব আবদুল মতিন। অনশনকারীদেরকে ফলের রস খাওয়ানোর পর তাদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "এ বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের নৈতিক পরাজয়। এ সরকার স্বৈরাচারের স্তম্ভ। ছাত্র আন্দোলনের মুখে তারা পিছু হটেছে।" জনাব মতিন বলেন, "সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকারই ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস করছে।" আন্দোলনকারীদের সামনে এই বক্তৃতার পর তাদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আর খোলাসা করে বলার প্রয়োজন মনে হয় না। ২৪ তারিখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ ঘটানো হল তখন ২৫ তারিখে 'বিএনপি,' 'জামায়াত' প্রভৃতি দল কি তার দুই-তিনগুণ বড় সমাবেশ ঘটাতে পারত না?

সরকারের বিলম্বিত বোধোদয় ঘটেছে। ছাত্রদলকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চলছে। তবুও ভাল, Better late than never. শাসক দলের গভীরভাবে এই আপ্তবাক্যটি বোঝার সময় এসেছে যে, "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।"